ইসলামী আকীদা ও প্রাসঙ্গিক পরিভাষাসমূহ

বিশ্বাস বা ধর্মবিশ্বাস বুঝাতে মুসলিম সমাজে সাধারণত দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়: 'ঈমান' ও 'আকীদা'। কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফে সর্বদা 'ঈমান' শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে। 'আকীদা' বা অন্য কোনো শব্দ কুরআন, সুন্নাহ বা সাহাবীগণের যুগে ব্যবহৃত হয় নি। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে 'ধর্ম-বিশ্বাস' বুঝাতে আরো কিছু পরিভাষা এ বিষয়ে পরিচিতি লাভ করে।

ইসলামের ধর্ম-বিশ্বাস ও এ বিষয়ক মূলনীতিসমূহ অত্যন্ত সহজ, সরল, যৌক্তিক ও মানবীয় প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমরা জানি যে, ধর্ম-বিশ্বাসের মূল ভিত্তি 'গাইব' বা অদৃশ্য বিষয়াদির উপর। স্রষ্টার অস্তিত্ব, তাঁর গুণাবলি, ফিরিশতা, সৃষ্টিজগতের সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক, সৃষ্টিজগতের নিয়ন্ত্রণে ও বিচারে স্রষ্টার কর্ম, পরকালীন জীবন, ইত্যাদি সবই মূলত অদৃশ্য বিষয়। পঞ্চ-ইন্দ্রিয় বা মানবীয় জ্ঞান, বুদ্ধি বা বিবেক দিয়ে এগুলির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। মানবীয় জ্ঞান, বুদ্ধি বা বিবেক এগুলির বাস্তবতা ও সাম্ভ্যবতা অনুভব ও স্বীকার করে। কিন্তু এগুলির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। মানুষ বিবেক, বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করে, কিন্তু তাঁর সত্তার প্রকৃতি, পরিধি, গুণাবলির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এ বিষয়ে যুক্তি বা বুদ্ধি দিয়ে অনেক বিতর্ক করা সম্ভব, তবে কোনো সুনির্ধারিত ঐকমত্যে পৌঁছানো যায় না। এজন্যই মূলত বিশ্বাসের বিষয়ে ওহীর উপরে নির্ভর করতে হয়।

ইসলামের বিশ্বাস বিষয়ক নির্দেশাবলির ক্ষেত্রে সাহাবীগণের নীতি ছিল যে, কুরআন কারীমে বা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মুখে এ বিষয়ে যা কিছু তাঁরা শুনেছেন বা জেনেছেন, সেগুলিকে বিনা বাক্যে ও নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করেছেন। এগুলির বিষয়ে অকারণ যুক্তিতর্কের আরোপ করেন নি।

ইসলামের প্রসারের সাথে সাথে পারস্য, ইরাক, সিরিয়া, মিসর ও অন্যান্য বিজিত দেশের অনেক মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আগমন করেন। এ সকল মানুষ নিজেদের পূর্ববর্তী ধর্মের প্রভাবে এবং তাদের সমাজের প্রচলিত বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের প্রভাবে ধর্মীয় বিশ্বাসের বিষয়ে বিভিন্ন বিতর্কের সূত্রপাত করেন। এদের বিতর্কের বিষয়ে ইসলামী ধর্মবিশ্বাসের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হন তাবিয়ীগণ ও পরবর্তী যুগের ইমামগণ। তাঁরা ধর্মবিশ্বাসের খুঁটিনাটি বিষয় আলোচনার জন্য 'ঈমান' ছাড়াও অন্যান্য কিছু পরিভাষা ব্যবহার করেন। এসকল পরিভাষার মধ্যে রয়েছে 'আল-ফিকহুল আকবার', 'ইলমুত তাওহীদ', 'আস-সুন্নাহ', 'আশ-শরীয়াহ', 'আল-আকীদাহ' ইত্যাদি।

এগুলির মধ্যে 'আকীদাহ' পরিভাষাটি সবচেয়ে পরে প্রচলিত হলেও সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করে। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে, ৪র্থ হিজরী শতাব্দীর পূর্বে এ পরিভাষাটির তেমন কোনো প্রচলন দেখতে পাওয়া যায় না। এমনকি ৪র্থ হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত সংকলিত আরবী অভিধান গ্রন্থগুলিতেও 'আকীদা' (عَقِيدَة) শব্দটি পাওয়া যায় না। পরবর্তী কালে আকীদা শব্দের ব্যবহার ব্যাপকতা লাভ করে। নিম্নে আমরা ইসলামী বিশ্বাস বা ধর্ম-বিশ্বাস অর্থে ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিভাষা আলোচনা করব:

ঈমান ও ইসলাম

আরবী 'আমন' শব্দ থেকে ঈমান শব্দটির উৎপত্তি। আম্‌ন (أمن) অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা, আস্থা, বিশ্বস্ততা, হৃদয়ের স্থিতি ইত্যাদি। ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ: নিরাপত্তা প্রদান, আস্থা স্থাপন, বিশ্বাস ইত্যাদি। শব্দটির অর্থ সম্পর্কে ৪র্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ আবুল হুসাইন আহমদ ইবনু ফারিস (৩৯৫হি) বলেন: "হামযা, মীম ও নূন: এই ধাতুটির মূল অর্থ দুটি: প্রথম অর্থ: বিশস্ততা, যা খিয়ানতের বিপরীত এবং দ্বিতীয় অর্থ বিশ্বাস করা বা কোনো ব্যক্তি বা বিষয়ের সত্যতা স্বীকার করা। আমরা দেখছি যে, অর্থ দুটি খুবই নিকটবর্তী ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।"[১]

তিনি উভয় অর্থে ঈমান শব্দের অর্থ আলোচনা করে উল্লেখ করেন যে, প্রথম অর্থে ঈমান অর্থ নিরাপত্তা প্রদান করা বা আমানতদার বলে মনে করা। আর দ্বিতীয় অর্থে ঈমান অর্থ বিশ্বাস করা, বিশ্বস্ততায় আস্থা স্থাপন করা।[২]

বিশ্বাস বা ধর্মবিশ্বাস বিশ্বাস অর্থে কুরআন ও হাদীসে সর্বদা 'ঈমান' শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে। ক্রিয়ার ক্ষেত্রে 'বিশ্বাস করল' অর্থে 'আ-মানা, আমানূ ইত্যাদি ক্রিয়াপদ, 'বিশ্বাস কর' অর্থে তু'মিনু, নু'মিনু ইত্যাদি ক্রিয়াপদ, আদেশ অর্থে 'আ-মিন, আ-মিনূ ইত্যাদি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে। বিশ্বাসী অর্থে মুমিন, মুমিনূন ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর বিশ্বাস অর্থে

---

[১] ইবনু ফারিস, আহমদ (৩৯৫হি), মু'জামু মাকায়িসিল লুগাহ ১/১৩৩।

[২] প্রাগুক্ত ১/১৩২-১৩৩।

'ঈমান' শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে:

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالإِيمَانَ

"আর যারা ঈমান ও ইলম (বিশ্বাস ও জ্ঞান) প্রদত্ত হয়েছে তারা বলল...।"[৩]

অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে:

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"আর কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করলে তার কর্ম বিনষ্ট বা নিষ্ফল হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[৪]

অন্যত্র বলা হয়েছে:

رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا

"হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের দিকে আহ্বান করতে শুনেছি: 'তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনয়ন কর'; সুতরাং আমরা ঈমান আনয়ন করেছি।"[৫]

অন্যত্র ঘোষণা করা হয়েছে:

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا

"যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে।"[৬]

আব্দু কাইস গোত্রের প্রতিনিধিদের বিষয়ে ইবনু আব্বাস (রা) বলেন,

أَمَرَهُمْ بِالإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ....

"রাসূলুলাহ (ﷺ) তাদেরকে 'একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমানের' নির্দেশ প্রদান করেন এবং বলেন, তোমরা কি জান যে, একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান কী? তাঁরা বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিকতর অবগত আছেন। তিনি বলেন (একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান এই যে,) তুমি সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবূদ (ইবাদত যোগ্য বা উপাস্য) কেউ নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর রাসূল...।"[৭]

হাদীস শরীফে সর্বদা 'বিশ্বাস' বা ধর্মবিশ্বাসকে ঈমান নামেই অভিহিত করা হয়েছে। এক হাদীসে আবূ হুরাইরা (রা) বলেন:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رجل (جِبْرِيلُ) فَقَالَ: يا رسول الله، مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ: الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الآخر، وتؤمن بالقدر كله. قَالَ: مَا الإِسْلامُ؟ قَالَ: الإِسْلامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلاةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ

"একদিন নবী (ﷺ) লোকজনের মধ্যে ছিলেন। এমতাবস্থায় একব্যক্তি (জিবরাঈল আ.) তাঁর নিকট আগমন করে বলেন, ঈমান কী? তিনি উত্তরে বলেন: (ঈমান এই যে,) তুমি বিশ্বাস করবে আল্লাহয়, তাঁর ফিরিশতাগণে, তাঁর পুস্তকসমূহে, তাঁর সাক্ষাতে, তাঁর রাসূলগণে এবং তুমি বিশ্বাস করবে শেষ পুনরুত্থানে এবং তুমি বিশ্বাস করবে তাকদীর বা নির্ধারণের সবকিছুতে। তিনি প্রশ্ন করেন: ইসলাম কী? তিনি বলেন: ইসলাম এই যে, তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, কোনো কিছুকে তাঁর সাথে শরীক বানাবে না, সালাত কায়েম করবে, ফরয যাকাত প্রদান করবে এবং রামাদানের সিয়াম পালন করবে।"[৮]

এখানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঈমান ও ইসলামের উভয়ের পরিচিত প্রদান করেছেন। ইসলাম শব্দটি আরবী 'সালাম' (سلم)

---

[৩] সূরা (৩০) রূম : ৫৬ আয়াত।

[৪] সূরা (৫) মায়িদা: ৫ আয়াত।

[৫] সূরা (৩) আল-ইমরান: ১৯৩ আয়াত।

[৬] সূরা (৮) আনফাল: ২ আয়াত।

[৭] বুখারী, আস-সহীহ ১/২৯, ৪৫, ৪/১৫৮৮, ৬/২৬৫২, ২৭৪৭; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৪৭।

[৮] বুখারী, আস-সহীহ ১/২৭, ৪/১৭৩৩; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩৯, ৪০, ৪৭।

শব্দ থেকে গৃহীত। এর অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা, সমর্পন ইত্যাদি। ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পন করা, অনুগত হওয়া ইত্যাদি। আভিধানিক ভাবে ঈমান বিশ্বাসের দিক এবং ইসলাম কর্মের দিক। তবে ব্যবহারিক ভাবে ঈমান ও ইসলাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এ বিষয়ে আমরা ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বলেন:

والإيمان هو الإقرار والتصديق، وإيمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن به، ويزيد وينقص من جهة اليقين والتصديق . والمؤمنون مستوون في الإيمان والتوحيد متفاضلون بالأعمال . والإسلام هو التسليم والانقياد لأوامر الله تعالي. فمن طريق اللغة فرق بين الإيمان والإسلام . ولكن لا يكون إيمان بلا إسلام، ولا يوجد إسلام بلا إيمان ، وهما كالظهر مع البطن، والدين اسم واقع علي الإيمان والإسلام والشرائع كلها

"ঈমান হচ্ছে (মুখের) স্বীকৃতি ও (অন্তরের) সত্যায়ন। বিশ্বাসকৃত বিষয়াদির দিক থেকে (যে যে বিষয়ে বিশ্বাস করা হয়েছে তাতে) আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীদের ঈমান বাড়ে না এবং কমে না, কিন্তু ইয়াকীন বা বিশ্বাসের দৃঢ়তা-গভীরতা ও সত্যায়নের দিক থেকে ঈমান বাড়ে এবং কমে। এভাবে ঈমান ও তাওহীদের ক্ষেত্রে মুমিনগণ সকলেই সমান। কর্মের ক্ষেত্রে তাদের মর্যাদার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। ইসলাম অর্থ আল্লাহর নির্দেশের জন্য আত্মসমর্পন করা এবং অনুগত হওয়া। আভিধানিকভাবে ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তবে বাস্তবে ও ব্যবহারে ইসলাম ছাড়া কোনো ঈমান হয় না এবং ঈমান ছাড়া ইসলামের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। কাজেই ঈমান ও ইসলাম হলো পিঠের সাথে পেটের ন্যায়। ঈমান, ইসলাম ও সমস্ত শরীয়তকে একত্রে দীন বলা হয়।"[৯]

ঈমান ও আমলের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগের বিভক্তির কারণগুলির অন্যতম। খারিজীগণ ও তাদের সমমনা ফিরকাগুলি আমল বা ইসলামের বিধান মত কর্ম করাকে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে গণ্য করেছে। ফলে বিধান পালনের বিচ্যুতি তাদের মতে ঈমানের বিচ্যুতি বা কুফর বলে গণ্য। অপরদিকে মুরজিয়াগণ ঈমানকে আল্লাহর নির্দেশ পালন বা ইসলামের বিধিবিধান পালন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করেছে। তাদের মতে কোনোরূপ ইসলাম পালন ছাড়াই ঈমানের চূড়ান্ত পূর্ণতায় পৌঁছানো সম্ভব। তারা পাপী মুসলিমকে পরিপূর্ণ ঈমানদার ও নিশ্চিত জান্নাতী বলে গণ্য করেছে। উভয় মতের মধ্যে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারীগণ বিশ্বাস করেন যে, পাপী মুমিন কাফির নন, আবার ঈমানের পূর্ণতাও তিনি লাভ করেন নি। তবে এ বিশ্বাসের ব্যাখ্যায় আহলুস সুন্নাতের ইমামগণের পারিভাষিক সংজ্ঞার মধ্যে সামান্য কিছু পার্থক্য রয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাদের দুটি মত রয়েছে।

(১) ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) ও অন্যান্য কোনো কোনো ইমামের মতে আমল বা বিধান পালন ঈমানের অংশ নয়, বরং ঈমানের দাবি ও সম্পূরক। তাদের মতে ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস ও মুখে সে বিশ্বাসের স্বীকৃতির নাম। তাদের মতে বিষয়বস্তুর দিক থেকে স্বীকৃতি বেশি কম হয় না বা ঈমানের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, তবে বিশ্বাসের গভীরতার দিক দিয়ে হ্রাসবৃদ্ধি হয়।

(২) অন্য তিন ইমাম ও মুহাদ্দিসগণ বলেন যে, আমল বা কর্ম ঈমানের অংশ, তবে মনের বিশ্বাস বা মুখের স্বীকৃতির মত অংশ নয়, বরং দ্বিতীয় পর্যায়ের অংশ। এজন্য তাদের মতে কর্মের অনুপস্থিতি দ্বারা ঈমানের অনুপস্থিতি প্রমাণিত হয় না, তবে দুর্বলতা ও কমতি প্রমাণিত হয়। তাঁর বলেন ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস, মুখের স্বীকৃতি ও দেহের কর্ম। এদের মতে কর্মের কারণে ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়।

এ দু মতের মধ্যে শব্দ প্রয়োগে যতই পার্থক্য থাক না কেন, মূল বিশ্বাসে কোনো পার্থক্য নেই। কারণ উভয় মতের অনুসারিগণই একমত যে,

(১) ঈমান ও আমল দুটিই আল্লাহর নির্দেশ এবং বান্দাকে দুটিই অর্জন করতে হবে। ঈমান বিহীন ইসলাম বা ইসলাম বিহীন ঈমান অকল্পনীয়।

(২) কর্মের ত্রুটির কারণে বা কবীরা গোনাহের কারণে বান্দা কাফির হয় না, তবে আল্লাহর শাস্তির যোগ্য হবে।

আল-ফিকহুল আকবার

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) আকীদা বিষয়ে রচিত তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থটির নাম রেখেছেন 'আল-ফিকহুল আকবার'। সম্ভবত 'আকীদা' বুঝাতে এটিই প্রাচীনতম পরিভাষা।

'ফিক্হ' শব্দটি কুরআন ও হাদীসে বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ। কুরআন হাদীসের আলোকে ইসলামী বিধিবিধানে গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে 'ফিকহ' বলা হয়। কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে বিশ্বাসের বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্জনের গুরুত্ব বুঝাতেই সম্ভবত তিনি এ বিষয়ক জ্ঞানকে 'আকবার' বা 'শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান' বা 'মহোত্তর জ্ঞান' বলে অভিহিত করেন।

---

[৯] মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১৪১-১৫০।

ইলমুত তাওহীদ

ইসলামী ঈমান বা বিশ্বাসকে অনেক সময় 'তাওহীদ' বলে আখ্যায়িত করা হয় এবং এ বিষয়ক জ্ঞানকে 'ইলমুত তাওহীদ' বা তাওহীদের জ্ঞান বলা হয়। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) আল-ফিকহুল আকবার গ্রন্থে 'ইলমুল আকীদা'-কে 'ইলমুত তাওহীদ' নামে অভিহিত করেছেন। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখব যে, তাওহীদ বা আল্লাহর একত্বই ইসলামী ঈমান বা আকীদার মূল ভিত্তি। ঈমানের অন্য সকল বিষয় তাওহীদের সাথে জড়িত ও তাওহীদেরই অংশ। এজন্যই ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) ইলমুল আকীদা বুঝাতে ইলমুত তাওহীদ পরিভাষা ব্যবহার করেছেন।

এ পরিভাষাটিও দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে বিশেষ পরিচিত লাভ করে। এ নামে আকীদা বিষয়ক কিছু গ্রন্থ রচনা করা হয়। এগুলির মধ্যে রয়েছে চতুর্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবূ বাক্‌র মুহাম্মাদ ইবনু খুযাইমা (৩১১ হি) রচিত 'কিতাবুত তাওহীদ' এবং অষ্টম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ আলিম আব্দুর রাহমান ইবনু আহমদ ইবনু রাজাব হাম্বালী (৭৯৫ হি) রচিত 'কিতাবুত তাওহীদ'।

আস-সুন্নাহ

তৃতীয় হিজরী শতক থেকে ধর্ম-বিশ্বাস ও এ বিষয়ক মূলনীতিসমূহ বুঝাতে 'আস-সুন্নাহ' শব্দটির ব্যবহার ব্যাপকতা লাভ করে।

'সুন্নাহ' বা 'সুন্নাত' শব্দের আভিধানিক অর্থ: মুখ, ছবি, প্রতিচ্ছবি, প্রকৃতি, জীবন পদ্ধতি, কর্মধারা ইত্যাদি।[১০] ইসলামী শরীয়তে 'সুন্নাত' অর্থ রাসূলে আকরাম (ﷺ) -এর কথা, কর্ম, অনুমোদন বা এক কথায় তাঁর সামগ্রিক জীবনাদর্শ।[১১] সুন্নাহ শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ও ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'এহইয়াউস সুনান' গ্রন্থে। বিদগ্ধ পাঠককে গ্রন্থটি পাঠ করতে অনুরোধ করছি।

আমরা উল্লেখ করেছি যে, সাহাবীগণের পরবর্তী প্রজন্ম থেকে ঈমান বা ধর্ম-বিশ্বাস বিষয়ক কিছু বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করা হয়। যুক্তি, তর্ক, দর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে বিশ্বাস বিষয়ক কুরআন ও হাদীসের নির্দেশাবলি বিচার করে কোনোটি গ্রহণ ও কোনোটি ব্যাখ্যার নামে বর্জন করতে শুরু করেন কোনো কোনো নতুন মুসলমান। এ বিষয়ে তারা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত বা কোনো কোনো হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করলেও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের সামগ্রিক মূলনীতির বাইরে চলে যেতেন। এদের বিভ্রান্তি প্রকাশ করতে এবং বিশ্বাসের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের মূলনীতি আলোচনা করতে তৃতীয় শতাব্দী থেকে অনেক ইমাম ও আলিম 'আস-সুন্নাহ' নামে 'আকীদা' বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন।

এদের অন্যতম ছিলেন ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল (২৪১ হি)। তিনি 'আস-সুন্নাহ' নামে আকীদা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। একই নামে আকীদা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন তাঁর প্রসদ্ধি ছাত্র ইমাম আবূ বাকর আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হানি আল-আসরাম (২৭৩হি), ইমাম আবূ আলী হাম্বাল ইবনু ইসহাক ইবনু হাম্বাল আশ-শাইবানী (২৭৩হি), ইমাম আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনুল আস'আস আস-সিজিসতানী (২৭৫ হি), ইমাম আবূ বাকর আহমদ ইবনু আমর ইবনু আবী আসিম আদ-দাহ্‌হাক আশ-শাইবানী (২৮৭ হি), ইমাম আব্দুলাহ ইবনু আহমাদ ইবনু হাম্বাল (২৯০ হি), ইমাম আবূ বাক্‌র আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হারূন আল-বাগদাদী আল-খালাল (৩১১ হি), ইমাম আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইবনু জারীর তাবারী (৩১১ হি), ইমাম তাবারানী আবুল কাসিম সুলাইমান ইবনু আহমদ (৩৬০হি), ইমাম আবূশ শাইখ আবু মুহাম্মাদ আব্দুলাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু জাফার ইবনু হাইয়ান আল-আসপাহানী (৩৬৯ হি), ইমাম ইবনু শাহীন আবূ হাফস উমার ইবনু আহমাদ ইবনু উসমান আল-বাগদাদী (৩৮৫হি), ইমাম আবূ আব্দুলাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক ইবনু মান্‌দাহ আল-ইসপাহানী (৩৯৫ হি) ও আরো অনেক প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ।

আশ-শারী'আহ

'শারীয়াত' বা 'শারী'আহ' অর্থ নদীর ঘাট, জলাশয়ে পানি পানের স্থান, পথ ইত্যাদি। ইসলামের পরিভাষায় 'শরী'আহ' শব্দটির বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। সেগুলির মধ্যে একটি অর্থ "ধর্ম বিশ্বাস" বা বিশ্বাস বিষয়ক মূলনীতিসমূহ।[১২] তৃতীয় শতকের কোনো কোনো ইমাম "আশ-শারী'আহ" নামে আকীদা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। যেমন ইমাম আবূ বাক্‌র মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন

---

[১০] ইবনু মানযুর, লিসানুল আরব ১৩/২২৪-২২৫।

[১১] সুন্নাতের ব্যবহারিক অর্থ দখুন: আলউদ্দীন বুখারী, কাশফুল আসরার আলা উসূলিল বাযদাবী ২/৬৫৩, মুলা আলী কারী, শরাহু শারহি নুখবাতিল ফিকর, পৃ: ১৫৩-১৫৬।

[১২] আল-ফাইউমী, আল-মিসবাহুল মুনীর ১/৩১০; মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম আল-হামদ, আকীদাতু আহলিস সুন্নাহ, পৃ. ১৬-১৭

আল-আজুর্‌রী (৩৬০ হি) রচিত "আশ-শরী'আহ" গ্রন্থ।

উসূলুদ্দীন বা উসূলুদ্দিয়ানাহ

উসূলুদ্দীন (أصول الدين) বা উসূলুদ্দীয়ানাহ (أصول الديانة) অর্থ দীনের ভিত্তিসমূহ। চতুর্থ শতক থেকে কোনো কোনো আলিম 'ঈমান' বা আকীদা বুঝাতে এই পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন চতুর্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ আলিম ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনু ইসমাঈল আল-আশ'আরী (৩২৪ হি)। 'আল-ইবানাতু 'আন উসূলিদ্দিয়ানাহ' নামে এ বিষয়ক তাঁর গ্রন্থটি সুপ্রসিদ্ধ।

আকীদা

ধর্ম-বিশ্বাস বিষয়ক প্রসিদ্ধতম পরিভাষা 'আকীদা'। হিজরী চতুর্থ শতকের আগে এ শব্দটির প্রয়োগ তত প্রসিদ্ধ নয়। চতুর্থ হিজরী শতক থেকে এ পরিভাষাটি প্রচলন লাভ করে। পরবর্তী যুগে এটিই একমাত্র পরিভাষায় পরিণত হয়।

আকীদা ও ই'তিকাদ শব্দদ্বয় আরবী 'আক্‌দ (عقد) ধাতু থেকে গৃহীত। এর অর্থ বন্ধন করা, গিরা দেওয়া, চুক্তি করা, শক্ত হওয়া ইত্যাদি। ভাষাবিদ ইবনু ফারিস এ শব্দের অর্থ বর্ণনা করে বলেন: "আইন, ক্বাফ ও দাল: ধাতুটির মূল অর্থ একটিই: দৃঢ় করণ, দৃঢ়ভাবে বন্ধন, ধারণ বা নির্ভর করা। শব্দটি যত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা সবই এই অর্থ থেকে গৃহীত।[১৩]

'ধর্মবিশ্বাস' বুঝাতে আকীদা শব্দের ব্যবহার পরবর্তী যুগগুলিতে ব্যাপক হলেও প্রাচীন আরবী ভাষায় এ ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় না। 'বিশ্বাস' বা ধর্মবিশ্বাস অর্থে 'আকীদা' ও 'ই'তিকাদ' শব্দের ব্যবহার কুরআন ও হাদীসে দেখা যায় না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে বা তাঁর পূর্বের যুগে আরবী ভাষায় 'বিশ্বাস' অর্থে বা অন্য কোনো অর্থে 'আকীদা' শব্দের ব্যবহার ছিল বলে জানা যায় না। তবে 'দৃঢ় হওয়া' বা 'জমাট হওয়া' অর্থে 'ই'তিকাদ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া অন্তরের বিশ্বাস অর্থেও 'ইতিকাদ' শব্দটির প্রচলন ছিল। প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ইসমাঈল ইবনু হাম্মাদ জাওহারী (৩৯৩ হি) বলেন:

اعتقد ضيعة ومالا، أي اقتناها، واعتقد الشيء: صلب واشتد، واعتقد كذا بقلبه، وليس له معقود، أي عقد رأي.

"সম্পত্তি বা সম্পদ 'ই'তিকাদ' করেছে, অর্থাৎ তা অর্জন করেছে বা সঞ্চয় করেছে। কোনো কিছু 'ই'তিকাদ' হয়েছে অর্থ তা শক্ত, কঠিন বা জমাটবদ্ধ হয়েছে। অন্তর দিয়ে অমুক বিষয় ই'তিকাদ করেছে। তার কোনো মা'কুদ নেই, অর্থাৎ তার মতামতের স্থিরতা বা দৃঢ়তা নেই।"[১৪]

কুরআন-হাদীসে কোথাও আকীদা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে বলে জানা যায় না। 'ইতিকাদ' শব্দটি দু একটি হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে, তবে 'বিশ্বাস' অর্থে নয়, বরং সম্পদ, পতাকা ইত্যাদি দ্রব্য দৃঢ়ভাবে ধারণ করা, বন্ধন করা বা গ্রহণ করা অর্থে। যেমন এক হাদীসে বারা ইবনু আযিব (রা) বলেন,

لَقِيْتُ عَمِّيْ رضي الله عنه وقد اعْتَقَدَ رَايَةً

"আমার চাচার সাথে আমার যখন সাক্ষাত হলো তখন তিনি (যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে) একটি ঝাণ্ডা দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছেন।"[১৫]

দ্বিতীয় শতাব্দীর কোনো কোনো ইমাম ও আলিমের কথায় 'ই'তিকাদ' বা 'আকীদা' শব্দ সুদৃঢ় ধর্ম বিশ্বাস অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে দেখা যায়।[১৬] পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে 'আকীদা' শব্দের ব্যবহার ব্যাপকতা লাভ করে।

চতুর্থ-পঞ্চম শতকে লিখিত প্রাচীন আরবী অভিধানগুলিতে 'আকীদা' শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে বলে দেখতে পাই নি। 'আক্‌দ' ধাতু থেকে গৃহীত আরবী ভাষায় ব্যবহৃত অনেক বিশেষ্য শব্দ এ সকল অভিধানে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন 'ইক্‌দ' (عِقْدٌ), 'উকদাহ' (عُقْدَةٌ), 'উকাইদাহ' (عُقَيْدَةٌ), 'আকীদ' (عَقِيْد) ইত্যাদি। কিন্তু 'আকীদাহ' শব্দটি এ সকল অভিধানে দেখতে পাই নি। ইবনু দুরাইদের (৩৩১ হি) জামহারাতুল লুগাহ, জাওহারীর (৩৯৩হি) আস-সিহাহ, ইবনু ফারিসের (৩৯৫হি) মু'জামু মাকাঈসিল

---

[১৩] ইবনু ফারিস, মু'জামু মাকায়িসিল লুগাহ ৪/৮৬।

[১৪] আল-জাওহারী, ইসমাঈল ইবনু হাম্মাদ (৩৯৩হি.), আস সিহাহ ২/৫১০; ইবনু মানযূর, মুহাম্মাদ ইবনু মুকাররম (৭১১ হি.) লিসানুর আরব ৩/২৯৯।

[১৫] ইবনুল জারূদ, আল-মুনতাকা ১/১৭১; বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৭/১৬২। আরো দেখুন: ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ৭/৪৮৭; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৭/৯০।

[১৬] ইমাম আবূ হানীফা, নু'মান ইবনু সাবিত (১৫০হি), আল-ফিকহুল আকবার (মুলা আলী কারীর শারহ-সহ), পৃ. ১৮; ইমাম তাহাবী, আবূ জা'ফর আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ (৩২১হি), আল-আকীদা আত-তাহাবীয়্যাহ (মুহাম্মাদ আল-খামীসের শারহ-সহ) পৃ. ৯।

লুগাহ, ইবনু মানযূরের (৭১১ হি) লিসানুল আরব ইত্যাদি অভিধান গ্রন্থে 'আকীদাহ' শব্দটির উল্লেখ পাই নি। পরবর্তী সময়ের অভিধানবিদগণ এই শব্দটির অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন। ৮ম শতকের প্রসিদ্ধ অভিধানবেত্তা আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-ফাইউমী (৭৭০হি) তাঁর আল-মিসবাহুল মুনীর গ্রন্থে লিখেছেন:

العقيدة ما يدين الإنسان به، وله عقيدة حسنة: سالمة من الشك

"মানুষ ধর্ম হিসেবে যা গ্রহণ করে তাকে 'আকীদা' বলা হয়। বলা হয় 'তার ভাল আকীদা আছে', অর্থাৎ তার সন্দেহমুক্ত বিশ্বাস আছে।"[১৭]

আধুনিক ভাষাবিদ ড. ইবরাহীম আনীস ও তাঁর সঙ্গিগণ সম্পাদিত 'আল-মু'জামুল ওয়াসীত' গ্রন্থে বলা হয়েছে: "

العقيدة: الحكم الذي لا يُقْبَلُ الشكُّ فيه لدى معتقده، و(في الدين) ما يقصد به الاعتقاد دون العمل

"আকীদা অর্থ এমন বিধান বা নির্দেশ যা বিশ্বাসীর বিশ্বাস অনুসারে কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ রাখে না .... ধর্মীয় বিশ্বাস যা কর্ম থেকে পৃথক... ।"[১৮]

ইলমুল কালাম

ইসলামী আকীদা বা ধর্মীয় বিশ্বাস বিষয়ক আলোচনা বা গবেষণাকে অনেক সময় 'ইলমুল কালাম' (علم الكلام) বলা হয়। ইলমুল কালাম বলতে মূলত ধর্মবিশ্বাসের বিষয়ে দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা ভিত্তিক আলোচনা বুঝানো হয়।

'আল-কালাম' (الكلام) শব্দের অর্থ কথা, বাক্য, বক্তব্য, বিতর্ক (word, speech, conversation, debate) ইত্যাদি। কেউ কেউ মনে করেন যে কালামুল্লাহ বা আল্লাহর কালাম (كلام الله) থেকে ইলমুল কালাম পরিভাষাটির উদ্ভব। কারণ ইলমুল কালামে আল্লাহর কালাম বিষয়ে আলোচনা হয়। তবে যতটুকু বুঝা যায় গ্রীক লগস (logos) শব্দ থেকে 'কালাম' শব্দটি গৃহীত হয়েছে। লগস (logos) শব্দটির অর্থ বাক্য, যুক্তিবৃত্তি, বিচারবুদ্ধি, পরিকল্পনা (word, reason, plan) ইত্যাদি। এ লগস শব্দ থেকে লজিক (logic) শব্দটির উৎপত্তি, যার অর্থ তর্কশাস্ত্র বা যুক্তিবিদ্যা। সম্ভবত মূল গ্রীক অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে হিজরী দ্বিতীয় শতকের আরবী পণ্ডিতগণ লজিক অর্থ ইলমুল কালাম বা 'কথা-শাস্ত্র' বলেছিলেন। পরবর্তীকালে এ অর্থে 'ইলমুল মানতিক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার আভিধানিক অর্থও 'কথা-শাস্ত্র'।

সর্বাবস্থায় ইলমুল কালাম বলতে দর্শন বা যুক্তিবিদ্যা ভিত্তিক ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনা বা গবেষণা (speculative theology, scholastic theology) বুঝানো হয়।

প্রাচীন যুগ থেকে দার্শনিকগণ মানবীয় যুক্তি, বুদ্ধি, জ্ঞান বা দর্শনের মাধ্যমে মানবীয় ইন্দ্রিয়ের অজ্ঞাত বিষয় সমূহ নিয়ে গবেষণা করেছেন। স্রষ্টা, সৃষ্টি, সৃষ্টির প্রকৃতি, স্রষ্টার প্রকৃতি, কর্ম, বিশেষণ ইত্যাদি বিষয়ে যুক্তি তর্ক দিয়ে তাঁরা অনেক কথা বলেছেন। এ সকল বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিতর্ক মানুষকে অত্যন্ত আকর্ষিত করলেও তা কোনো সত্যে পৌঁছাতে পারে না। কারণ আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখব যে, মানুষ যুক্তি, বুদ্ধি বা জ্ঞান দিয়ে স্রষ্ঠার অস্তিত্ব সম্পর্কে অনুভব করতে পারে বা নিশ্চিত হতে পারে, কিন্তু স্রষ্টার প্রকৃতি, কর্ম, বিশেষণ, স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে চূড়ান্ত সত্যে পৌঁছাতে পারে না। এজন্য কখনোই দার্শনিকগণ এ সকল বিষয়ে একমত হতে পারেন নি। তাদের গবেষণা ও বিতর্ক অন্ধের হাতি দেখার মতই হয়েছে।

দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে গ্রীক, ভারতীয় ও পারসিক দর্শন প্রচার ও প্রসার লাভ করে। সাহাবীগণের অনুসারী মূলধারার তাবিয়ীগণ ও তাঁদের অনুসারী আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলিমগণ ঈমান বা আকীদার বিষয়ে বা গাইবী বিষয়ে দার্শনিক বিতর্ক কঠিনভাবে অপছন্দ করতেন। কারণ তাঁর বিশ্বাস করতেন যে, গাইবী বিষয়ে ওহীর উপর নির্ভর করা এবং ওহীর নির্দেশনাকে সর্বান্তকরণে মেনে নেওয়াই মুমিনের মুক্তির পথ। প্রসিদ্ধ চার মুজতাহিদ ইমাম সহ দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিজরী শতকের সকল প্রসিদ্ধ আলিম, ইমাম, ফকীহ ও মুহাদ্দিস অত্যন্ত কঠোর ভাষায় ইলমুল কালামের নিন্দা করেছেন।[১৯] যেমন ইমাম আবূ ইউসূফ রাহ. (১৮৯ হি) তাঁর ছাত্র ইলমুল কালামের পণ্ডিত ও মু'তাযিলী আলিম বিশ্‌র আল-মারীসীকে বলেন:

العلم بالكلام هو الجهل والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل: زنديق.

"কালামের জ্ঞানই হলো প্রকৃত অজ্ঞতা আর কালাম সম্পর্কে অজ্ঞতাই হলো প্রকৃত জ্ঞান। ইলমুল কালামে সুখ্যাতির

---

[১৭] ফাইউমী, আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ (৭৭০ হি), আল-মিসবাহুল মুনীর ২/৪২১।

[১৮] ড. ইবরাহীম আনীস ও সঙ্গিগণ, আল-মুজাম আল ওয়াসীত ২/৬১৪।

[১৯] আবূ হামিদ গাযালী, ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন ১/৩৩, ৫২-৫৩; ইবনু আবিল ইয্য, শারহুল আকীদা আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ৭২-৭৭, ২০৪-২১০।

অর্থ তাকে যীনদীক বা অবিশ্বাসী-ধর্মত্যাগী বলা হবে ।"[২০]

ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ) আরো বলেনঃ

من طلب العلم بالكلام تزندق

"যে ব্যক্তি ইলমু কালাম শিক্ষা করবে সে যিনদীক পরিণত হবে ।"[২১]

ইমাম শাফিয়ী রাহ. (২০৪ হি) বলেন,

حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام.

"যারা ইলমুল কালাম চর্চা করে তার বিষয়ে আমার বিধান এই যে, তাদেরকে খেজুরের ডাল ও জুতা দিয়ে পেটাতে হবে, এভাবে মহল্লায় মহল্লায় ও কবীলাসমূহের মধ্যে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে এবং বলতে হবেঃ যারা কিতাব ও সুন্নাত ছেড়ে ইলমুল কালামে মনোনিবেশ করে তাদের এ শাস্তি ।"[২২]

৫ম হিজরী শতাব্দী থেকে আহলুস সুন্নাতের কোনোকোনো আলিম ইসলামী আকীদা বা আলহুস সুন্নাতের আকীদা ব্যাখ্যার জন্য ইলমুল কালামের পরিভাষা ও পদ্ধতি ব্যাবহার করেছেন এবং আকীদা শাস্ত্রকে ইলমুল কালাম নামে অভিহিত করেছেন । বিভ্রান্ত ফিরকাসমূহের বিভ্রান্তির উত্তর প্রদানের একান্ত প্রয়োজনেই তারা ইলমুল কালামের পরিভাষা ও পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন ।[২৩]

[২০] ইবনু আবিল ইয্য হানাফী, শারহুল আকীদাহ আত-তাহাবীয়্যাহ, পৃ. ৭৫

[২১] ইবনু আবিল ইয্য, শারহুল আকীদাহ আত-তাহাবীয়্যাহ, পৃ. ৭৫

[২২] ইবনু আবিল ইয্য, শারহুল আকীদাহ আত-তাহাবীয়্যাহ, পৃ. ৭৫

[২৩] আবূ হামিদ গাযালী, ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন ১/৩৩, ৫২-৫৩; ইবনু আবিল ইয্য, শারহুল আকীদা আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ৭২-৭৭, ২০৪-২১০ ।